ভারতীয় বস্তুবাদের উত্তরাধিকার

বিরঞ্জন রায়

গত তিন সংখ্যায় 'ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ' শিরোনামে ভারতীয় দর্শন নিয়ে তিন কিস্তি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বে লেখক সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করেছেন। এই অনুসন্ধানে এই অঞ্চলের চৈতন্যে মুসলিম আগমন, ঔপনিবেশিক শাসনের বিবিধ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে লেখক লোকায়ত দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ সংস্কার, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে বস্তুবাদী ধারার চিহ্ন শনাক্ত করেছেন। আমরা এই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিতভাবে আরো লেখা/মতামত/বিতর্ক প্রকাশে আগ্রহী।

১.১। দার্শনিক পটভূমি

দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ ভারতে দর্শনচর্চার ধারাটিতে প্রাণচাঞ্চল্যের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের ভারত জয় ও রাজত্ব কায়েমের পর দর্শনচর্চায় বৈচিত্র্য কমে আসে। হিন্দু দর্শনের প্রধান প্রতিপক্ষ বৌদ্ধরা দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেন। চার্বাক ধারাটিও শুকিয়ে যায়। রঙ্গমঞ্চে রয়ে যায় হিন্দু এবং তাদের অপ্রধান প্রতিপক্ষ জৈনরা। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন রূপ নেয় নব্যন্যায়-এ। এতে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন একটি ধারায় সংহত হয়। কিন্তু 'প্রমেয়'কে ছাপিয়ে 'প্রমাণ' হয়ে ওঠে প্রধান আলোচ্য। মীমাংসকদের দুটি ধারা ভাট্ট ও প্রাভাকর তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। শক্তিশালী হয়ে ওঠেন বৈদান্তিকরা। তাঁরা সাংখ্য-যোগ দর্শনকে এসবের মূল প্রতিজ্ঞা থেকে সরিয়ে এনে বৈদান্তিকায়িত করে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তর্কের প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে বেদান্তের অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত–এ তিন ধারা, আর সামগ্রিকভাবে মীমাংসা ও বেদান্তের সঙ্গে নব্যন্যায়ের বিরোধ। মীমাংসক ও বৈদান্তিকরা যেমন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন, নৈয়ায়িকরা তেমনটি নন। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী মাত্র।

শংকর ছিলেন শৈব। তিনি শিবস্তোত্র রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাত অদ্বৈত বেদান্ত, শৈব সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচারের পরিপোষক মতবাদ নয়। ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতাদ্বৈত বা দ্বৈত ভাষ্যকাররা বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সদস্য। তাঁরা তাঁদের দার্শনিক ব্যাখ্যায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও আচারকে সমর্থন করেছেন। শৈব সম্প্রদায়গুলো তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বৈষ্ণবদের মতো, নিজেদের বিশ্বাস ও আচারের সমর্থনে দার্শনিক মতবাদ রচনায় প্রয়াসী হয়েছে। এ জন্য তারা ব্রহ্মসূত্রের শৈবভাষ্য রচনা করেছে কিংবা নিজেদের আগমশাস্ত্র ভিত্তিক দর্শন রচনা করেছে। দার্শনিক বিবেচনায় এসব অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত– এ তিন ধারায়ই বিস্তৃত।

বৈদিক ব্যাকরণের ঐতিহ্যকে বিকশিত করে, পাণিনি ব্যাকরণের মহাগ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে। এর টীকা-ভাষ্যের ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকে রচিত পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'। ব্যাকরণের এই শক্তিশালী ঐতিহ্যটি ভারতীয় দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ব্যাকরণের ঐতিহ্যে বর্তমান কিন্তু অসূত্রায়িত, এমন কিছু ধারণা থেকে ব্যাকরণের একটি নিজস্ব দর্শন গড়ে তোলেন ভর্তৃহরি, তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে (৪৫০ খ্রি.)। ব্যাকরণের এই ক্ষীণ কিন্তু উজ্জ্বল ধারাটি প্রাক-উপনিবেশকাল পর্যন্ত বহমান ছিল। এই ধারার শেষ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক নাগেশ ভট্ট (১৮ শতক)।

সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নসম্পদে 'তন্ত্র' সমর্থক নিদর্শন আছে। সাংখ্য দর্শনের ভিত্তি সেই আদি তন্ত্র। তন্ত্র পরিবর্তিত রূপে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বহাল রেখেছে। তন্ত্রের অনুসারীদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন– সব সম্প্রদায়ের মানুষকেই পাওয়া যায়। তন্ত্র অনুসারী হিন্দুরা শাক্ত নামে পরিচিত। তন্ত্র অনুসারী বৌদ্ধ মতগুলো বজ্রযান, সহজযান ইত্যাদি নামে পরিচিত। তন্ত্রের বিশাল সাহিত্য রচিত হয়েছে। তন্ত্রসাহিত্যে অন্তর্লীন একটি দর্শন রয়েছে। কিন্তু তন্ত্রের অনুসারীরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো স্বতন্ত্র কোনো দর্শনশাস্ত্র গড়ে তোলেননি। ভারতীয় রসায়নবিদদের কাজ তন্ত্র প্রভাবিত। ভারতীয় রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোও তন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। রসায়নবিদদের নিজস্ব একটি দর্শন রয়েছে, রসেশ্বর দর্শন নামে যা পরিচিত। এটি তান্ত্রিক দর্শনেরই গোষ্ঠীভুক্ত।

শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে যত পার্থক্য বা বিরোধই থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে তাদের মিল আছে। সেটি হলো, সাধনার জন্য গুরু প্রয়োজন এবং বীজমন্ত্র প্রয়োজন।

১.২। সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি

অষ্টম শতাব্দী থেকেই ভারতে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। এদের প্রধান অংশই ছিল বণিক, যারা ভারতীয় উপকূলে বসতি স্থাপন করে। অপ্রধান অংশটি সিন্ধু অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে। আরেকটি অংশ উত্তর-পশ্চিম ভারতে মাঝে মাঝে লুটপাট চালাত, বসতি গড়ত না। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই উত্তর-পশ্চিমের আক্রমণকারীরা রাজত্ব স্থাপন শুরু করে। এ দেশে মুসলমানদের শাসন শাসক শ্রেণির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বদল ঘটিয়েছে। জনসংখ্যার একাংশের মধ্যে একটি অভারতীয় ধর্মের অনুসারী সৃষ্টি করেছে, কিন্তু সমাজ-কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন করেনি। মুসলিম শাসকদের বাহিত পারস্য-মধ্যএশীয়-আরব্য সংস্কৃতি এ দেশের ভাষায় সাহিত্যে কৃৎকৌশলে সংগীতে স্থাপত্যে চিত্রকলায় ও রন্ধনশৈলীতে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ভারতীয় ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সংশ্লেষণে এক ধরনের সমন্বয়বাদী ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এটি উভয় ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনে কোনো সংশ্লেষ ঘটেনি। আয়ুর্বেদ ও ইউনানি আলাদাই রয়ে গেছে। ইসলামি দর্শনের অভিঘাতে নতুন কোনো দার্শনিক ধারাও গড়ে ওঠেনি। তবে রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরোক্ষভাবে দর্শন ও ধর্মকে প্রভাবিত করেছে।

সপ্তম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদী ধর্ম-আন্দোলন ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চিরাচরিত বিচিত্র দেবদেবীর প্রাধান্য কমে গিয়ে প্রধান হয়ে ওঠেন একক দেবতা, শিব কিংবা বিষ্ণু। এঁরাই হয়ে ওঠেন যথাক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঈশ্বর। হোম-পূজার বদলে প্রেমমিশ্রিত ভক্তিই হয়ে ওঠে উপাসনার উপায়। এ উপাসনায় ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা প্রয়োজন নেই। গীতবাদ্য- সহযোগে আচরিত এই সমবেত উপাসনায় ভক্তদের জাতপাতের ব্যবধানটিও তীক্ষ্ণ নয়। ক্রমে এই ভক্তিবাদী আন্দোলনের দার্শনিকরাও আবির্ভূত হন। এঁরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভ ও দ্বৈতবাদী মাধ্ব। এঁরা সবাই দক্ষিণ ভারতীয়

বৈষ্ণব। বৈষ্ণবদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষিণ ভারতের শৈব সম্প্রদায়গুলো তাদের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ গড়ে তোলে। এই ভক্তিবাদী আন্দোলন পরে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর ভারতের এই ভক্তিবাদী আন্দোলন থেকেই হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়বাদী ধর্ম-আন্দোলনের উদ্ভব। সমন্বয়বাদী ধর্ম-আন্দোলনের প্রথম প্রধান ব্যক্তিত্ব কবির (১৪২৫-১৫১৮ খ্রি.)।

ভক্তিবাদী ধর্ম-আন্দোলন কিংবা এর দার্শনিকদের মতবাদের উপাদানসমূহ ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যেই বর্তমান ছিল। প্রশ্ন, কেন সে সময় এসব অপ্রধান উপাদান প্রধান হয়ে উঠল? নিশ্চয়ই এর পেছনে সে সময়ের আর্থসামজিক ও দার্শনিক পরম্পরাগত কারণ কাজ করেছে। তবে সে সময় ভারতে আগত ইসলামের (বিশেষত সুফি প্রভাবিত) কিছু বৈশিষ্ট্যও যে ক্রিয়াশীল ছিল, এমন অনুমান অসংগত নয়। ভক্তিবাদের এই দিকগুলো হচ্ছে, একেশ্বরবাদের প্রতি গুরুত্বদান, আবেগাপ্লুত সমবেত উপাসনা, আত্মনিবেদন ও গুরুভক্তি। এসবের সঙ্গে রয়েছে কঠোর বর্ণব্যবস্থার এবং আচারসর্বস্বতার বিরোধিতা।

উত্তর ভারতে নিম্নবর্গের মধ্যে সমন্বয়বাদী ধর্ম-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মোগল আগমনের আগেই। আকবর (রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫) রাজনৈতিক বিচেনায় দরবারি সমন্বয়বাদী ধর্ম 'দীন-ই-এলাহি' প্রবর্তন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও রাজনীতিতে আকবরের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করেন। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দারাশিকো (১৬১৫-১৬৫৯) এক সমন্বয়বাদী ধর্মগুরু লালদাস বা বাবালালের শিষ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে পারেননি। তাঁরই ছোট ভাই আওরঙ্গজেব (রাজত্বকাল ১৬৫৮-১৭০৭) সিংহাসন দখলের জন্য তাঁকে ধর্মদ্রোহের অজুহাতে হত্যা করেন। আওরঙ্গজেব ধর্মনিরপেক্ষতার মোগল ঐতিহ্য বর্জন করে কট্টর শরিয়তি ধারায় রাষ্ট্রশাসন শুরু করেন। তাঁর শাসনামলে যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়, কট্টর শরিয়তের প্রয়োগ এর একটি কারণ। তিনি প্রবল চেষ্টায় সাম্রাজ্যের সীমানা অটুট রাখেন বটে, তাঁর মৃত্যুর পরই সাম্রাজ্যের অবসান সূচিত হয়।

মুসলিম শাসকরা কোথাও কোথাও ভারতীয় দর্শনচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ভারতের দর্শনচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপ কর্মতৎপর ছিল (১৪৫০-১৭৫০) মুসলিম শাসনকালে। ভারতীয় ও ইসলামি দর্শনের মধ্যে সংশ্লেষ না ঘটলেও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের পরিচয় ঘটেছে মুসলমানদের মাধ্যমে। যেমন–ভারতীয় দশমিক পদ্ধতি মুসলমানদের মাধ্যমেই ইউরোপে বাহিত হয়েছিল। শাহজাদা দারাশিকো ভারতীয় ও ইসলামি দর্শনের মধ্যে একটি সমন্বয়ের প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এটি রুদ্ধ হয়ে যায়। দারাশিকোর উদ্যোগে ৫০টি উপনিষদের পারসি অনুবাদ সম্পাদিত হয় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে। আঁকেতিল দ্য পেরঁ নামের এক ফরাসি পর্যটক সেই পুঁথি দেশে নিয়ে যান এবং এর লাতিন অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ও শেলিংয়ের। শেলিংয়ের মুখে উপনিষদের প্রশংসা শুনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন ভারত-তত্ত্ববিদ ম্যাক্সুলর। এভাবে আধুনিক ইউরোপ ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়। একই সময়ে ভারতে নতুন করে উপনিষদচর্চার সূত্রপাত ঘটান রাজা রামমোহন রায়।

> বৈদিক ব্যাকরণের ঐতিহ্যকে বিকশিত করে, পাণিনি ব্যাকরণের মহাগ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা করেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে। এর টীকা-ভাষ্যের ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ খ্রিস্টপূর্ব দুই শতকে রচিত পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'। ব্যাকরণের এই শক্তিশালী ঐতিহ্যটি ভারতীয় দর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্রিটিশ অধিকারের অভিঘাতটি ছিল মুসলিম রাজত্বের অভিঘাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রিটিশরা এখানে রাজত্ব করতে আসেনি, এসেছে উপনিবেশ গড়তে। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ব্রিটিশ সংস্কৃতির পার্থক্য শুধু সাংস্কৃতিক নয়, আর্থসামাজিক স্তরগত। যেখানে ভারতে দীর্ঘকাল এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি চালু ছিল, সেখানে ব্রিটিশ নিয়ে এলো পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এতে ভারতীয় সমাজে একটা আমূল পরিবর্তনের সূচনা হলো। এর ঢেউ প্রথম লাগল শহরাঞ্চলে, পরে ক্রমেই তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে পুরনো উচ্চবর্গ তার মান হারাল। নতুন যে উচ্চবর্গ গড়ে উঠল, তারা ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করল জান্তে এবং অজান্তে। ভারতীয় ধারার ঐতিহ্যবাহী দর্শনচর্চা লোপ পেল।

২। বস্তুবাদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার : উচ্চবর্গে

ভারতে ব্রিটিশবিরোধী প্রথম সংগ্রামগুলো চালিত হয়েছিল ক্ষমতাচ্যুত কিংবা ক্ষমতা হারানোর হুমকিতে থাকা দেশীয় শাসক শ্রেণির নেতৃত্বে। নিম্নবর্গ এতে অংশ নিয়েছে। এ ছাড়াও ছিল নিম্নবর্গের নিজস্ব সংগ্রাম। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতজন এগুলোকে সমর্থন করেনি। ক্ষমতাহীন দেশীয় শাসক শ্রেণি ক্রমে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু নিম্নবর্গের অস্তিত্বের মতো তাদের প্রতিরোধও কখনোই নিঃশেষ হয়নি। এমনকি তারা যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে, তখনো মাঝেমধ্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতজন ব্রিটিশদের সমর্থন করেছিল। কারণ উপনিবেশকারীদের স্বার্থের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল। এই স্বার্থ মুৎসুদ্দি পুঁজি, জমিদারি এবং সরকারি চাকরির স্বার্থ। শ্রমজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। এই উচ্চবর্গের পুঁজি বিকশিত হতে থাকলে এবং চাকরির সুযোগ সংকুচিত হতে থাকলে ব্রিটিশদের সঙ্গে তাদের বিরোধ শুরু হয়। অবশ্য এই দুপক্ষের সম্পর্কে বিরোধটি একমাত্র বিষয় নয়, দুয়ের সহযোগিতাও ছিল। কারণ নিম্নবর্গের স্বার্থের সঙ্গে দুপক্ষের স্বার্থের একটি অপরিবর্তনেয় বিরোধ ছিল। এই বিরোধ শোষক ও শোষিতের। তাই উচ্চবর্গ নিজেদের সুযোগ বাড়াতে চাইলেও নিম্নবর্গের ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। এসবের প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। শুরুতে এই আন্দোলনে শ্রমজীবী জনতার সম্পৃক্ততা ছিল না। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি বড়ানোর প্রয়োজনেই উচ্চবর্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। উচ্চবর্গের কেউ কেউ কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হন। ফলে এসব আন্দোলন ক্রমে শ্রেণিসচেতন আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়।

ভারতীয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে এখানে মোটাদাগে তিনটি বৃহৎ ধারায় চিহ্নিত করা হয়েছে– উচ্চবর্গের ব্রিটিশ সমর্থক ও ব্রিটিশবিরোধী ধারা এবং নিম্নবর্গ। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধানকেও আমরা মোটাদাগে তিনটি ধারায় বিভক্ত করতে পারি। তবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এই ধারাগুলোর মধ্যে সম্পর্কটি সরলরৈখিক নয়, জটিল। উপনিবেশকারীদের অনুগত ধারাটির কারো কারো কাছে যা কিছু ইউরোপীয় তা-ই শ্রেষ্ঠ, পক্ষান্তরে যা কিছু ভারতীয় তা-ই নিকৃষ্ট, যেমন– 'ইয়ং বেঙ্গল'। আবার ইউরোপীয় 'জ্ঞানালোকে' উদ্দীপিত রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথরা ভারতীয়ত্বকে সংস্কার করতে চেয়েছেন; বাদ দিতে নয়। জাতীয়তাবাদী মূল ধারাটির প্রতিনিধিরা ইউরোপের তুলনায় ভারতীয়ত্বকে বড় করে দেখাতে চান। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর তিলক, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ চিন্তকরা এই দলের। কিন্তু ভারতীয়ত্বের সমর্থক ও বিরোধী–দুটি ধারাই জান্তে কিংবা অজান্তে উপনিবেশকারীদের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। উপনিবেশকারীরা তাদের ঔপনিবেশিক নীতির সমর্থনের জন্য এমন ধারণা প্রচার করত,

ইউরোপীয়রাই মানব সমাজের অগ্রসর জাতি (race)। তারা সভ্য এবং যুক্তিবাদী। পক্ষান্তরে উপনিবেশের জাতিরা অসভ্য, এখনো যুক্তির স্তরে উঠতে পারেনি। তাই তাদের 'সভ্য' করাটা উপনিবেশকারীদের দায়। ভারতের ক্ষেত্রে তাদের সমীকরণটি দাঁড়াল, ভারতীয় মানেই আধ্যাত্মিক ও রহস্যবাদী। বিপরীতে ইংরেজ মানেই ইহজাগতিক ও যুক্তিবাদী। মুসলমান রাজত্বের শুরুর সময় থেকেই বেদান্ত দর্শন ভারতে প্রাধান্যশীল দর্শন হয়ে উঠছিল। উপনিবেশকারীরা দেখাতে চাইল, এটিই ভারতের নিজস্ব দর্শন। জাতীয়তাবাদী উচ্চবর্গ একেই সমর্থন করল। কারণ নিম্নবর্গকে দাবিয়ে রাখার জন্য এটি উচ্চবর্গের পরীক্ষিত দর্শন। উচ্চবর্গের অন্য একটি অংশ ব্রিটিশদের বিরোধিতা না করলেও তাদের অনুকরণ করতে চাইত না। তারা চাইত ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের মতো, প্রাধান্যশীল ধর্মাশ্রিত (ব্রাহ্মণ্যবাদী) সংস্কৃতির স্থলে একটি সেক্যুলার সংস্কৃতি নির্মাণ করতে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারকে এই দলে ফেলতে পারি। জাতীয়তাবাদীদের সবাই ভারতীয়ত্বই শ্রেষ্ঠ– এই মোহে ভুগতেন না। তাঁরা বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের ধারা এগিয়ে নিয়ে যান, যেমন– প্রফুল্লচন্দ্র। পরে এতে যোগ দিলেন নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল কিংবা দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা। যেমন– দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষক। শুরু হয় নতুন করে ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন। এর উদ্দেশ্য সেক্যুলার সংস্কৃতি নির্মাণে ঐতিহ্যের নবায়ন এবং ঐতিহ্যের সমালোচনামূলক আত্মীকরণ। এটিই তৃতীয় ধারা।

আধুনিককালে ভারতের মাটিতে ভারতীয় বিদ্যাচর্চার সূচনা হয় ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এটি স্থাপিত হয় স্যার উইলিয়ম জোন্সের উদ্যোগে ব্রিটিশদের দ্বারা। ১৮২৯ সালে এর দ্বার ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়। চার্বাক দর্শনের সঙ্গে উপনিবেশিত ভারতের নতুন পরিচয় ঘটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ও সম্পাদনায় এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত সায়ন-মাধবের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থটির মাধ্যমে (প্রকাশকাল ১৮৫৩-৫৮ খ্রি.)। বিদ্যাসাগর শুধু সংস্কৃত বইটি সম্পাদনা করেই ক্ষান্ত হলেন না, তার বাংলা তর্জমারও ব্যবস্থা করলেন। এ দায়িত্ব তিনি দেন তাঁরই শিক্ষক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে। জয়নারায়ণ এবং তাঁর ছাত্র মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মিলে এই তর্জমার কাজ সম্পন্ন করেন। বইটি কলিকাতা থেকে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়। 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' প্রকাশের পর প্রথমে বাংলায়, তারপর ভারতের অন্যত্র এবং ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে চার্বাকচর্চার সূচনা হয়। বাংলা অঞ্চলে চার্বাক চর্চাকারীদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই/প্রবন্ধ :

পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, ভারতের নাস্তিক্য দর্শনের ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন, ১৯০৯ খ্রি.।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন, বঙ্গদর্শন, ১৯১১ খ্রি.।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, লোকায়ত (ইংরেজিতে), ১৯২৫ খ্রি.।

দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, চার্বাক দর্শন, ১৯৫৯ খ্রি., পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮২ খ্রি., চার্বাক দর্শনের ৬০টি শ্লোক ও ১০০টি সূত্র সংকলন করেন। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দর্শনকে সমর্থন জানান।

সরোজ আচার্য, চার্বাক দর্শন, পূর্বাশা, অগ্রহায়ণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, প্রথম মার্কসীয় মূল্যায়ন।

ক্ষিতিমোহন সেন, লোকায়ত মত, পূর্বাশা, পৌষ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। এর নিদর্শন তাঁর 'লোকায়ত' গ্রন্থ (১৯৫৬ খ্রি), এর পরিবর্ধিত ইংরেজি রূপ 'লোকায়ত' (১৯৫৯ খ্রি); ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, ১৯৮৭ খ্রি (এর ইংরেজি ও হিন্দি তর্জমা হয়েছে), মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সম্পাদিত চার্বাক/লোকায়ত (ইংরেজিতে, ১৯৯০ খ্রি.)।

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, চার্বাক দর্শন, ১৯৯৩ খ্রি, চার্বাক বিরোধীদের শ্রেণিস্বার্থের বিশ্লেষণ রয়েছে এতে।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, চার্বাকচর্চা, ২০১০ খ্রি, চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে বিশ্বকোষ উপম গ্রন্থ।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, চার্বাক আপোসহীন বস্তুবাদী। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ মাধ্যমিক ও যোগাচারী ধারা এবং অদ্বৈত বেদান্ত আপোসহীন ভাববাদী। অন্য দার্শনিক ধারাগুলো বস্তুবাদী (materialist) না হলেও বাস্তববাদী (realist), অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর বাস্তব দুনিয়াকে স্বীকৃতি দেয়। এসব দর্শনে বিভিন্ন মাত্রায় বস্তুবাদী উপাদান রয়েছে।

বেদান্ত মুগ্ধতাকে বর্জন করে ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নে প্রথম প্রয়াসীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। অক্ষয়কুমার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমবয়সী এবং একটি সেক্যুলার সংস্কৃতি নির্মাণে তাঁর সহযোদ্ধা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অক্ষয়কুমারের জীবনদর্শন। এর প্রচার ও প্রয়োগকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর সাংখ্য ও বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার বেকন ও কোঁতের দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের একটি মূল্যায়নে অগ্রসর হলেন। হিন্দু ষড়দর্শন সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন, "এই ষড়দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন নাই। কপিলকৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ, পতঞ্জলি ঈশ্বরের অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা না বলিয়া বিশ্বনির্মাতা মাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারো কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসা পণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রম মাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা কি?"

> মুসলিম শাসকরা কোথাও কোথাও ভারতীয় দর্শনচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ভারতের দর্শনচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে নবদ্বীপ কর্মতৎপর ছিল (১৪৫০-১৭৫০) মুসলিম শাসনকালে। ভারতীয় ও ইসলামি দর্শনের মধ্যে সংশ্লেষ না ঘটলেও ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের পরিচয় ঘটেছে মুসলমানদের মাধ্যমে।

বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়হীন দুটি দর্শন, যা ভারতীয় বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তি জুগিয়েছিল, সেই ন্যায়-বৈশেষিকের স্ববিরোধিতা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "এদিকে তো নাস্তিক, কিন্তু বেদ উভয়ের পরম শিরোধার্য বস্তু। এ তো একটি সামান্য কৌতুকের বিষয় নয়।" "একদিকে বেদ-বেদান্ত, অন্যদিকে বৌদ্ধ ও চার্বাক শাস্ত্র, গোতম (ন্যায়) ও কণাদ (বৈশেষিক) দর্শন ঐ উভয়ের মধ্যস্থলবর্তী।" বৈশেষিক সূত্রে তো ঈশ্বরের নামমাত্র নেই। ন্যায়সূত্রে ঈশ্বরের নাম আছে। অক্ষয়কুমার যুক্তি দেখান, ন্যায় দর্শনের ঈশ্বরও আরোপিত। প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান হয় তাকে প্রমেয় বলে। যেমন–আত্মা, দুঃখ ইত্যাদি। ন্যায় দর্শনে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়র বিষয় বিচার করা হয়েছে। এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়র বিবরণ দিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর-পদার্থ পরিগণিত হয় নাই কেন, এ কথাটি বিবেচ্য। ... যখন বিশ্বকারণ নিরূপণ দর্শনশাস্ত্রে একটি প্রধান প্রয়োজন, তখন প্রমেয় পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পৃথক নির্দেশ না করা কোনরূপেই সংগত ও সদ্ভাবিত নয়। একটি সূত্রে ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার পর সূত্রেই আবার মনুষ্যকৃত কর্মকে কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ... প্রথম সূত্রটি পূর্বপক্ষ ও পর সূত্রটি সিদ্ধান্ত। ... অতএব, গোতম কণাদের

ন্যায় নাস্তিকতাবাদী ছিলেন এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়া উঠে।"

হিন্দুদের সবচেয়ে প্রামাণ্য স্মৃতিশাস্ত্র (যাতে ব্যক্তির করণীয় বিষয়ে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ) মনুসংহিতার সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন, "ফলতঃ আমাদের ঋষি-মুনি প্রভৃতি সকলেই গো-খাদক ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে পাদ্রি উইলসন ও শেখ অলিউল্লার সহিত ঋষিরাজ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না। এদিকে আবার গো-বধে গুরুতর পাপ ও তাহার সুকঠিন প্রায়শ্চিত্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। অতএব, মনুসংহিতার ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন মতের বচন সমুদয় একত্র সংকলিত হইয়াছে বলিতে হয়।"

হিন্দুদের সর্বসম্প্রদায়মান্য ধর্মগ্রন্থ গীতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মহাভারতীয় মূল উপাখ্যানের সহিত ভগবদ্গীতার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঘোরতর যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে একখানি পরার্থ-প্রধান সংকলিত দর্শনশাস্ত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রকৃত 'হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান'। ঐ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য কি জান? জীবাত্মার ধ্বংস হয় না, অতএব যত ইচ্ছা নরহত্যা কর, তাহাতে কিছুমাত্র পাতক নাই।"

এ ধারায় অক্ষয়কুমার দত্তের সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৩)। তাঁর বিখ্যাত 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' (১ম খণ্ড ১৯০২ খ্রি., ২য় খণ্ড ১৯০৯ খ্রি.) এবং হরিষচন্দ্র কবিরত্নের সহসম্পাদনায় প্রকাশিত মধ্যযুগে রচিত রসায়নশাস্ত্রের বই 'রসার্ণব' (১৯১০ খ্রি.) শুধু ভারতবাসী নয়, বিশ্ববাসীর সামনে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার অতীতকে তুলে ধরল। প্রফুল্লচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে (১৮৬৪-১৯৩৮) আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি'র জন্য ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লিখে দিতে। ব্রজেন্দ্রনাথের এ উদ্যোগ ক্রমে একটি আলাদা বইয়ে রূপ নেয়–'দ্য পজিটিভ সায়েন্সেস অব এনশিয়েন্ট হিন্দুজ' (১৯১৫ খ্রি.)। এই কাজগুলোতে উৎসাহিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের এক ছাত্র সমাজতাত্ত্বিক বিনয় কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯ খ্রি.) প্রকাশ করেন 'হিন্দু অ্যাচিভমেন্টস ইন দ্য এক্সজেক্ট সায়েন্সেস' (১৯১৮ খ্রি.)। এভাবে ১৯২০ সালের মধ্যেই এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে ভারতে শুধু আধ্যাত্মিকতার চর্চা হয়নি। এখানে বিজ্ঞানচর্চার একটি দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র নির্বিচার জাতি-অভিমানকে প্রশ্রয় দেননি; ভারতীয় বিজ্ঞানের অর্জন ও সীমাবদ্ধতা উভয় দিকেই দৃষ্টি দিয়েছেন। বিজ্ঞানের দর্শন হিসেবে তিনি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন। বিজ্ঞানচর্চা রুদ্ধ হওয়ার জন্য দায়ী করেছেন জাতপ্রথা ও অদ্বৈত বেদান্তকে। জাতপ্রথা শ্রমজীবীদের শিক্ষা বঞ্চিত করেছিল। এতে কর্ম ও জ্ঞানের বিচ্ছেদ ঘটে। বেদান্ত দর্শন শেখায় জগৎকে মায়া বিবেচনা করতে। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সমাজসম্পৃক্ত রাজনীতিসচেতন বিজ্ঞানী। তাই তাঁর লেখায় ভারতের বৈজ্ঞানিক অর্জনসমূহ বর্ণিত হয়েছে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। শীল ও সরকারের রচনায় এ দিকটির ঘাটতি রয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরসূরি মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু– তাঁর প্রমুখ ছাত্র।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ফিলোজফি' (১ম খণ্ড ১৯২২খ্রি., ৫ম খণ্ড ১৯৫৪ খ্রি.) ভারতীয় দর্শনচর্চায় এক নতুন সংযোজন। এই মহাগ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের খ্যাত-অখ্যাত প্রায় সব ধারাই বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ভারতীয় দর্শনচর্চার ইতিহাসের সমগ্র ক্ষেত্রটি দৃষ্টিগোচর হয়। এভাবে উপনিবেশকারী এবং তাদের উপনিবেশের সহকারীদের প্রচারিত সূত্রটি, ভারত=আধ্যাত্মিক/রহস্যবাদী, ইউরোপ=ইহজাগতিক/যুক্তিবাদী, এর বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। এরপর সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ পুনর্মূল্যায়নের ধারায় অনেক গবেষকই এগিয়ে এসেছেন। যেমন–রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩ খ্রি.) এ দেশে লুপ্ত হয়ে যাওয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের পুঁথি উদ্ধারে অনুবাদে প্রচারে ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস গবেষণায় একটি মাইলফলক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণা। এর ফসল তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব সাইয়েন্স: এন্ড টেকনোলজি ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া' (১ম খণ্ড ১৯৮৬খ্রি., ৩য় খণ্ড ১৯৯৬ খ্রি.)।

৩.১। বস্তুবাদী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার : নিম্নবর্গে

জনসাধারণ সব সময়ই শাসিত, শোষিত এবং নির্যাতিত। শাসক পাল্টালেও তাদের ওপর শাসন শোষণ নির্যাতন পাল্টায় না। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন (সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদ) শাসন শোষণ নিপীড়নের ধরনে পরিবর্তন আনে, কিন্তু শাসন শোষণ নিপীড়ন থেকেই যায়। সদা সর্বত্র তাদের কায়িক-মানসিক শ্রমের মাধ্যমে টিকে থাকতে হয়। এই অধস্তনতা এড়ানোর কোনো পথ তাদের সামনে নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তাদের ঘটে না। নিজেদের সীমিত কর্মক্ষেত্র তাদের কাছে বিমূর্ত চিন্তারও দাবি করে না। অস্তিত্বের এই বিশেষ অবস্থাটি তাদের মানসিকতাকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়। সেটি কর্তৃত্বের প্রতি সহযোগিতা ও বিরোধিতার এক জটিল মনোভাব এবং বস্তুকেন্দ্রিক মূর্ত চিন্তা। এ জন্য উচ্চবর্গের সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করে নিজেদের মতো করে। কিন্তু নিজেদের অবস্থানটি সম্বন্ধে তারা পুরো সচেতন নয়। তাই বেশির ভাগ সময় তারা শাসক শ্রেণির দার্শনিক মায়াজালে আবদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র বিদ্রোহের সময়গুলোতেই তারা খানিকটা আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। এসব কারণে নিম্নবর্গের চিন্তায় পারমার্থিকতা ও বাস্তবতার মধ্যে এক ধরনের গোঁজামিল দেখা দিলেও বস্তুবাদিতাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। এ জন্য দেখি, এ দেশের জনগণের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী ধারার চেতনাটি বিকৃত হলেও হারিয়ে যায়নি। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ধারাটির অপর নাম 'লোকায়ত', অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

নিম্নবর্গের চিন্তায় পারমার্থিকতা ও বাস্তবতার মধ্যে এক ধরনের গোঁজামিল দেখা দিলেও বস্তুবাদিতাই এর মূল বৈশিষ্ট্য। এ জন্য দেখি, এ দেশের জনগণের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের বস্তুবাদী ধারার চেতনাটি বিকৃত হলেও হারিয়ে যায়নি। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী ধারাটির অপর নাম 'লোকায়ত', অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

শ্রমজীবী জনগণ শাসক শ্রেণির মতাদর্শে মোহান্ধ থাকে বলে তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণ ও চিন্তাভাবনায় শাসকদের ভাবাদর্শের প্রকাশটিই প্রকট। কেবল সতর্ক অনুসন্ধানেই তাদের নিজেদের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা সম্ভব। এ দেশে ভাবাদর্শের প্রধান বাহক ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি। শাসকরা এসবকে সবার জন্য প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম হিসেবেই প্রচার করে। এ কৌশলেই শাসকরা শ্রমজীবীদের ওপর নিজেদের ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটায়। এবং শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষক ধারণা আর এসবের ধারক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শ্রমজীবীদের কাছে তাদের শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে। সেকালে শাসকরা চার্বাকদের শিশ্নোদরপরায়ণ, নাস্তিক, পাষণ্ড– এসব অভিধা দিয়ে শ্রমজীবীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বর্তমানে শাসকরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কমিউনিস্টদেরও একই অভিধা দিয়ে যাচ্ছে।

উচ্চবর্গের দর্শন প্রকাশ করার জন্য পেশাদার দার্শনিকরা রয়েছেন। নিম্নবর্গের এমন পেশাদার দার্শনিক নেই। তাই নিম্নবর্গের দর্শনকে আমরা

একটি সূত্রবদ্ধ দর্শনের আকারে পাই না। নিম্নবর্গের দর্শনটিকে আমরা তাদের জীবনযাপন ও তাদের সৃষ্ট সংস্কৃতি থেকে নির্মাণ করে নিতে পারি। সাধারণ্যে বস্তুবাদের উত্তরাধিকার আলোচনায় আমাদের তা-ই করতে হবে। এ নিয়ে পদ্ধতিবদ্ধ গবেষণা খুব হয়নি। এ জন্য আমরা নির্ভর করছি সহজিয়া বৌদ্ধ, সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল এবং লোককবিদের রচনার ওপর। এঁরা সমাজে অন্ত্যজ, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীরা এঁদের আদর্শে চালিত হয় না। অবশ্য এঁদের সাহিত্য-সংগীতের প্রতি শ্রমজীবীরা একটি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ বোধ করে। কারণ এতে তাদের নিজেদের আধাসচেতন, অস্পষ্ট, অনুচ্চারিত বক্তব্যটিই বাণীরূপ পায়। শ্রমজীবীদের নিষ্ক্রিয় কিংবা সক্রিয় সমর্থন সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্ত্যজদের টিকে থাকার অন্যতম সামাজিক ভিত্তি। এ জন্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীদের সহজলক্ষ্য আচরণের চেয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্ত্যজ এসব সহজিয়া আউল-বাউলের রচনায়ই আমরা প্রাকৃতজনের দর্শনটিকে স্পষ্টরূপে পাই। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, নিম্নবর্গের সাহিত্যে ভাববাদী উপাদান এবং বস্তুবাদী ও ভাববাদী উপাদানের গোঁজামিলেরও নজিরও প্রচুর। এসব তাদের পূর্ববর্ণিত জটিল মানসিকতারই প্রতিফলন। এখানে আমরা নজর দিয়েছি বস্তুবাদী উপাদানের দিকে। কিন্তু তা দেখার আগে আমরা ভারতীয় বস্তুবাদের মূল প্রত্যয়গুলো আবার স্মরণ করে নিতে চাই। এগুলো : ভূত চৈতন্যবাদ বা দেহাত্মবাদ, স্বভাববাদ, প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ, পুনর্জন্ম ও পরলোক বিলোপবাদ, বেদপ্রামাণ্য তথা শাস্ত্রপ্রামাণ্য নিষেধবাদ এবং দুঃখবাদের বিরোধিতা। অবশ্য প্রাকৃতজনের মাঝে এমন সংস্কৃত বস্তুবাদ আশা করা ঠিক নয়। আমরা বরং বস্তুবাদের প্রাকৃত রূপই আশা করতে পারি।

প্রাক্ বিজ্ঞান যুগের মানুষ বস্তু থেকে প্রাণকে আলাদা করতে শেখেনি। প্রতিটি বস্তুতেই তারা প্রাণের প্রকাশ দেখেছে। তারা ছিল সর্বপ্রাণবাদী। এই সর্বপ্রাণবাদই তাদের বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তি রচনা করেছে।

৩.২। প্রাকৃতজনের জীবনে বস্তুবাদী দর্শন এমন বদ্ধমূল কেন?

সভ্যতার উন্মেষ কৃষিভিত্তিক সমাজে। সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভক্তি সভ্যতার অপরিহার্য অন্তর্লক্ষণ। কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ক্রমে শিল্পভিত্তিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এর সঙ্গে শ্রেণিবিভক্তির রূপও পাল্টাচ্ছে। কিন্তু শ্রেণিবিভক্তির অবসান হয়নি। আমাদের সমাজ প্রাগসভ্য অবস্থা থেকেই কৃষিভিত্তিক ছিল। বর্তমানে অনেক পরিবর্তনের মধ্যেও এর কৃষিভিত্তিটি টিকে আছে। প্রাগসভ্য অবস্থায় আমাদের সমাজ ছিল কৌম সমাজ। ক্রমে এই সমাজের সামন্ততান্ত্রিক রূপান্তর ঘটলেও কৌম ব্যবস্থার অবশেষ পুরো লোপ পায়নি। এই সমাজের পুঁজিবাদী রূপান্তর কৌম অবস্থার অবশেষগুলোর অবসান ঘটিয়েছে। এর কিছু সাংস্কৃতিক রেশ এখনো টিকে আছে। কৌম সমাজ ভাঙনের সঙ্গে যে শ্রেণিবিভক্তির সূচনা হয়েছিল, অনেক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে তা আরো তীব্র হয়েছে। তাই আমাদের সমাজ কৌম সমাজের কিছু সাংস্কৃতিক রেশসহ কৃষিভিত্তিক শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজ। লোকায়ত দর্শনের সূচনা হয়েছিল কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজে। আমাদের লোকসমাজের ওপরে উল্লিখিত বিশেষ আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থাই লোকায়ত জীবনে লোকায়ত দর্শন টিকে থাকার বস্তুগত ভিত্তি।

৩.৩.১। কৃষিজীবী সমাজের মূল দর্শন, 'তন্ত্র'

প্রাক্ বিজ্ঞান যুগের মানুষ বস্তু থেকে প্রাণকে আলাদা করতে শেখেনি। প্রতিটি বস্তুতেই তারা প্রাণের প্রকাশ দেখেছে। তারা ছিল সর্বপ্রাণবাদী। এই সর্বপ্রাণবাদই তাদের বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তি রচনা করেছে। আপন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সকল বস্তুর প্রাণকে তারা বশ করতে চেয়েছে এবং তা থেকেই জন্ম নিয়েছে ইন্দ্রজাল বা জাদুবিশ্বাস। আদিম মানুষ এমন কিছু অনুষ্ঠান পালন করেছে, যেসবের মধ্য দিয়ে তাদের কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তারা বিশ্বাস করেছে যে এসব অনুষ্ঠান বিধিসম্মতভাবে পালিত হলেই তাদের কামনা পূর্ণ হবে। এ সকল অনুষ্ঠানই আসলে জাদু-অনুষ্ঠান এবং অনুষ্ঠানে কামনা প্রকাশক যেসব মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে, সে সবই জাদুমন্ত্র। বর্তমানে যে ধরনের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে আমরা ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম-অনুষ্ঠান বলি, জাদুবিশ্বাস ও জাদু-অনুষ্ঠান তা থেকে স্পষ্টতই পৃথক। বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত কোনো কাল্পনিক শক্তির ওপর বিশ্বাসই ধর্মবিশ্বাসের মর্মমূলে বিদ্যমান; আর সেই শক্তির সন্তুষ্টি বিধানের যে অনুষ্ঠান, তা-ই ধর্ম-অনুষ্ঠান। কিন্তু বস্তুর বাইরে তার পৃথক কোনো শক্তিতে সর্বপ্রাণবাদী আদিম মানুষদের বিশ্বাস নেই। তাই তাদের কামনা অনুযায়ী ও প্রয়োজনমাফিক বস্তুকে পরিবর্তন করার জন্য আত্মশক্তির ওপরই তারা ভরসা রাখে; অন্য কোনো শক্তিশালী দেবতা বা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোনো স্তবস্তুতি-প্রার্থনা বা অনুষ্ঠানে আস্থা রাখে না। আপন ইচ্ছাশক্তি আরোপ করেই বস্তুকে দিয়ে তাদের প্রয়োজন সাধন করিয়ে নিতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করে; এই বিশ্বাসই জাদুবিশ্বাস। যেসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে বিশ্বাসকে তারা কার্যকর করতে চায়, সেসব অনুষ্ঠানই জাদু-অনুষ্ঠান। আদিম মানুষেরা দল বেঁধে নাচতে নাচতে আকাশের দিকে জলের ছিটে ছুড়ে দিয়ে ভাবে যে এভাবে বৃষ্টির একটা নকল তুলতে পারলেই আসল বৃষ্টিকে তারা ডেকে আনতে পারবে। এমন ধরনের জাদুবিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য অন্য অনেক জনগোষ্ঠীর মতো বাংলার প্রাকৃতজন আজও বহন করে চলেছে।

সর্বপ্রাণবাদ ও জাদুবিশ্বাস যে সরল বস্তুবাদকে ধারণ করে বেড়ে উঠেছে, সেই আদিম বস্তুবাদেরই অনুষঙ্গী হয়ে এসেছে ধন উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদনের অভিন্নতায় বিশ্বাস। অর্থাৎ সমাজ বিকাশের কোনো এক পর্যায়ে সন্তান উৎপাদন ও ধন উৎপাদনকে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ক্রিয়া বলে মানুষ শনাক্ত করতে পারেনি। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ স্যার জেমস ফ্রেজার দেখিয়েছেন : আদিম মানুষ প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য নর-নারীর মৈথুনকে অপরিহার্য বলে মনে করেছে; তারা ভেবেছে যে মৈথুনের মধ্য দিয়ে মানুষ ফলপ্রসূ হলে প্রকৃতিও তারই অনুকরণে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

এ ধরনের আদিম বস্তুবাদকে ঘিরেই প্রাচীন ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কালের গতিপ্রবাহে তন্ত্রে নানা প্রকার রূপান্তর ঘটেছে, বিকৃতি দেখা দিয়েছে, নানা বিকৃত ব্যাখ্যাও এ শাস্ত্রটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। তবু আমাদের প্রাকৃতজনের দর্শনকে বোঝাতে গেলে তন্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অন্তত হাজার বছরের কালসীমায় বাংলার প্রাকৃতজন তন্ত্রের ঐতিহ্য বহন করেই তাদের দর্শনের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটিয়েছে। আদিম মানুষের যে সরল বস্তুবাদ সকল বস্তুকেই প্রাণময় রূপে দেখেছে, বস্তুর রূপান্তরের জন্য জাদুবিশ্বাস ও জাদু-অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে শিখিয়েছে, দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলে মেনেছে, ধন উৎপাদন ও সন্তান উৎপাদনকে একই ক্রিয়া বলে জেনেছে– প্রাচীন তন্ত্র জনসাধারণের সেই বস্তুবাদী দর্শনেরই ধারক।

(চলবে)

বিরঞ্জন রায়: মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক।
ইমেইল: bibhanranjan@mail.com